মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৪র্থ বর্ষ, দশম সংখ্যা, মার্চ ২০২৪

নবম বার্ষিক উইন্টার স্কুল

জেনোসাইড স্টাডিজঃ রেসপন্স এন্ড রেসপন্সিবিলিটি

সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের নবম আসরটি হয়ে গেল ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত। এবারের উইন্টার স্কুলের প্রতিপাদ্য Genocide Studies : Response & Responsibility। বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যেমন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়সহ ভারত, ইন্দোনেশিয়ার মোট ৩৪ জন অংশগ্রহণকারী অংশ নিয়েছিলো আট দিনব্যাপী আয়োজিত এই আবাসিক স্কুলে। উইন্টার স্কুলের মূল উদ্দেশ্য ছিল তরুণ প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধ এবং গণহত্যা সম্পর্কে জানার আগ্রহ তৈরি করা এবং তাদের জন্য উচ্চতর গবেষণার দ্বার উন্মোচন করা।

শহিদ দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা প্রতিষ্ঠিত কুমুদিনী কমপ্লেক্স ছিলো এবারের উইন্টার স্কুলের আয়োজন স্থান। বেশ সাজানো গোছানো এবং প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে এ প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত।

আট দিনব্যাপী আয়োজিত উইন্টার স্কুলের উদ্বোধনী অধিবেশনে অতিথি হিসেবে ছিলেন মফিদুল হক, পরিচালক সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনসাইড অ্যান্ড জাস্টিস এবং ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর; রাজিব প্রসাদ সাহা, চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল লিমিটেড; মিসেস শ্রীমতী সাহা, পরিচালক, কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল লিমিটেড; হেনা সুলতানা, শিক্ষিকা, ভারতেস্বরী হোমস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর পরিচিতি পর্ব শেষে সন্ধ্যায় অংশগ্রহণকারীদের দেখানো হয় তারেক মাসুদ ও ক্যাথেরিন মাসুদ-নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'মুক্তির কথা'। দ্বিতীয়দিন চারটি সেশন নেন যথাক্রমে

৫- এর পৃষ্ঠায় দেখুন

জল্লাদখানা বধ্যভূমিতে যুদ্ধপুরাণ মঞ্চায়ন; চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

১৫ জানুয়ারি ২০২৪ আমরা আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করি যুদ্ধপুরাণ নিয়ে। যাত্রা মানে-মহড়া শুরু করি, জল্লাদখানা বধ্যভূমিতে। এবং জল্লাদখানা বধ্যভূমিতেই মার্চ মাসের ৩ তারিখ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৫টি প্রদর্শনী করি।

মহড়ার প্রস্তুতি

নির্দেশক কাজী আনিসুল হক বরুণ-এর চাহিদা চল্লিশজন নাট্যকর্মী কিন্তু আমাদের বধ্যভূমির সন্তানদল একদম নবীন। তাঁরা গান করে বটে তবে নাটক তো কোনদিন করেনি এবং তাঁরা বয়সেও নবীন। তার উপর সংখ্যাটাও বলার মত না। তাই মিরপুর সাংস্কৃতিক ঐক্য ফোরামের সাথে আলেচনায় বসি। কীভাবে সদস্য বাড়ানো যায়? ফোরামভুক্ত প্রতিটি দল থেকে নাট্যকর্মী আসলে কতজন হতে পারে? বা কীভাবে প্রচার করলে আমরা ৪০ জন সদস্য পেতে পারি। আমরা নট্যকর্মী আহ্বান করি। প্রচারণা চালাই স্যোসাল মিডিয়ায়। প্রথমে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দিলেও আশানুরূপ সদস্য না হওয়ায় সেই সময়টা বাড়িয়ে ১২ জানুয়ারি করি। ১২ তারিখ পর্যন্ত যে সাড়া পাই সেটাও হতাশাজনক। তারপরেও ১৫ জানুয়ারি থেকে আমরা মহড়ার জন্য বসতে শুরু করি। বয়সে নবীন ক'জন গানের শিল্পী ও আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আসা তরুণ কজন নাট্যকর্মী এবং প্রবীণ বলতে আমি এবং নির্দেশক। যদিও আমি এবং নির্দেশক, আমরা কেউই নিজেদের এখনই প্রবীণের স্তরে দেখতে চাই না।

এভাবেই যুদ্ধপুরাণ নিয়ে শুরু হয় যুদ্ধ জল্লাদখানা বধ্যভূমিতে। উপস্থিতি নিয়ে হতাশ নির্দেশক। আমিও ভিতরে ভিতরে কিছুটা হতাশ হলেও নির্দেশককে আশার বাণী শোনাই। আমাদের

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
বাংলাদেশের বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষার কবিতা পাঠ, সংগীত ও নৃত্য

‘ফুলে ফুলে শহিদ মিনার সাজি আগে ফুল পরি, সালাম রফিক জব্বার দাগির মোন দগ অযল আত্মাআনি
বরণ ভিরোন পুর্ণিমার পহ্‌রদগ পোরি আগন ফুলর বিচ্ছোনত’ . . . . . (চাঙমা ভাষা)

সকল ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতি বছরের মতো এবছরও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করে। আবৃত্তিশিল্পী রফিকুল ইসলাম কবি শামসুর রাহমানের ‘বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা’ কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। চাঙমা ভাষার কবি শিশির চাকমা রচিত কবিতা ‘ম’ আওঝর অরক’ সুহৃদ চাকমা রচিত কবিতা ‘রাঙামাত্যা’ এবং প্রিয়তোষ চাকমা রচিত ‘হি আর হোম’ কবিতা আবৃত্তি করেন হেমা চাকমা, স্রাব্দি তালুকদার ও প্রিয়তোষ চাকমা। কুড়মালী (মাহাতো) ভাষার পলাশ কুমার মাহাতো, তার রচিত কবিতা ‘আদর সোহাগের মেয়ে’ নিয়ে মঞ্চে আসেন। মতেন্দ্র মানকিন পাঠ করেন গারো ভাষায় তার রচিত কবিতা ‘তুমি আমার মানস প্রতিমা’ মারমা ভাষায় মংখিং ওয়াং মারমা, তার রচিত কবিতা ‘আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম’ পাঠ করেন। টুম্পা হাজং পাঠ করেন কবি নির্মলেন্দু গুণের হাজং ভাষায় অনুদিত কবিতা ‘আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি’, রিপন চন্দ্র বানাই তার নিজে রচিত বানাই ভাষার কবিতা ‘যাদের কাছে ঋণী আমি’ পাঠ করেন। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের ‘এই কথাটি মনে রেখো’ গানটি খ্রো ভাষায় অনুবাদ করে পাঠ করেন ক্রা ওয়ই খ্রো, স্বপন এককা রচিত ওঁরাও ভাষার কবিতা ‘তাঁতী মজুর চা শ্রমিকের আমিই প্রতিভু’ পাঠ করেন প্রনয় টপ্প। মনিপুরি ভাষার কবি সনাতন হামোম রচিত মনিপুরি ভাষার কবিতা ‘বিপ্লবের কথামালা’ নিয়ে মঞ্চে আসেন রুমিতা সিনহা। ককবরক ভাষার কবি হলাচন্দ্র ত্রিপুরা, তার রচিত কবিতা ‘প্রিয়তমা’ ও ‘আমার পার্বত্য’ পাঠ করেন হলাচন্দ্র ত্রিপুরা ও সাগর ত্রিপুরা, উর্দু ভাষার বিখ্যাত কবি কাইফি আজমি রচিত কবিতা ‘বাংলাদেশ’ আবৃত্তি করেন মো. জাভেদ এবং ‘পাপ গোপন কারী’ আবৃত্তি করেন মোহাম্মদ আ. মমিন, লিংহেই খুমী তার রচিত খুমী ভাষার কবিতা, ‘২১শে ফেব্রুয়ারি’ পাঠ করেন। সুমিতা মার্ডী রচিত সানতাল কবিতা ‘সান্তাল যুবক’ আবৃত্তি করেন আদিত্য মার্ডী, দেশওয়ালী কবিতা ‘ছড় কে চল গইল হিও, তবুও রহগইল হিও’ আবৃত্তি করেন রঞ্জিত রবিদাস, জাপানি কবিতা ‘নির্জন তীরে দাঁড়িয়ে’, চায়না কবিতা ‘হোম সিকনেস’ ও পালি কবিতা ‘ধর্মপদ’ নিয়ে মঞ্চে আসেন তানিম আহমেদ, মো. রাজু হোসেন ও জাহিদ হাসান। আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে কোচ সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিবেশনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানে বাংলাসহ ১৮টি ভাষায় কবিতা পাঠ করা হয়। কবিতাগুলোর বাংলা অনুবাদ পাঠ করেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পীরা। পরিশেষে সম্প্রীতির বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির মানুষের ভাষা সুরক্ষিত থাকুক, কোন বর্ণমালা যেন হারিয়ে না যায়।

রঞ্জন কুমার সিংহ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

এক্সপোজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস ২০২৪ | প্রথম পর্ব: ১৫-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

গত ১৫-১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে তিন দিনব্যাপী এক্সপোজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস ২০২৪-এর প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৫ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় জাদুঘরের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, কর্মশালা পরিচালক ফরিদ আহমদ, জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম, কর্মশালা প্রশিক্ষক ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা তানিম ইবনে ইউসুফ ও মাসউদুর রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শরিফুল ইসলাম শাওন।

এক্সপোজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রকল্প উন্নয়ন কর্মশালা এবং অর্থায়ন কার্যক্রম। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিবছর প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের জন্য বাংলাদেশের তরুণ ও আগ্রহী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছ থেকে নির্মাণ প্রস্তাব আহবান করে থাকে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারিদের মধ্য থেকে পিচিংয়ের মধ্য দিয়ে সেরা দুটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে সহায়তা প্রদান করে থাকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। কর্মশালায় নির্মাণ ভাবনা জমাদানের বিষয় উন্মুক্ত তবে মুক্তিযুদ্ধ ও মানবাধিকার সম্পর্কিত প্রকল্পগুলো অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। এবারের কর্মশালায় ৫৫টি প্রামাণ্যচিত্র প্রকল্প ভাবনা জমা পড়ে এবং তার মধ্য থেকে ২৪টি প্রথম পর্বের জন্য নির্বাচন করা হয়।

প্রথম পর্বের কর্মশালাটি ১১টি সেশনে ভাগ করা হয়েছিলো। এই ১১টি সেশন ৬জন প্রশিক্ষক পরিচালনা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সেশনগুলো ছিলো ট্রাস্টি মফিদুল হকের “মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস রচনায় প্রামাণ্যচিত্র”, কর্মশালা পরিচালক ফরিদ আহমদের “প্রামাণ্যচিত্রের প্রকল্প প্রস্তাবনা রচনার কলাকৌশল”, তানিম ইউসুফের “প্রস্তাবিত প্রামাণ্যচিত্রের ইম্প্যাক্ট ও কল্পনার কলাকৌশল”, এক্সপোজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস ২০২২-এর প্রথম বিজয়ী নির্মাতা মাসউদুর রহমানের “আইডিয়া থেকে নির্মাণ যাত্রা-দ্যা স্ক্র্যাপ”, চলচ্চিত্র নির্মাতা শবনম ফেরদৌসির “আইডিয়া কাঠামোবদ্ধকরণ ও ট্রিটমেন্ট” এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা হুমায়রা বিলকিসের “আইডিয়া বিনির্মাণের জন্য গবেষণা”।

কর্মশালার শুরুতে সঞ্চালক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলামকে জাদুঘর নিয়ে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেন। রফিকুল **৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন**

একজন ফাদার ইউজিন হোমরিক ও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

বর্তমান সময়ে এসে প্রতিনিয়ত একটা কথা আমরা প্রায় সকলেই শুনে থাকি, যা কিনা আবার ভবিষ্যৎ সময়ের কথা ভেবে আমাদের মনে ভীতি সঞ্চার করে। কথাটা হল, আমাদের আজকের যুব সমাজ বা এই প্রজন্ম তাদের ইতিহাস, সাহিত্য বা সংস্কৃতি থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে বা সেসব জিনিস ভুলতে বসেছে। তবে এই কথাটিকে খানিকটা বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়েই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত নবম উইন্টার স্কুলের এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বেরিয়ে পড়েছিল ইতিহাস সম্পর্কে জানতে, খুঁজে বের করতে সেই সব অজানা তথ্য, অজানা কিছু বীরত্বের গল্প, এবং বীর উপাধি পাওয়া যোগ্য মানুষের গল্প জানতে। ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের সময় যাদের আত্মত্যাগ এবং সাহস আমাদেরকে দিয়েছে আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

এবারের নবম উইন্টার স্কুল যা ৮ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছিল টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার কুমুদিনী কমপ্লেক্সে। এরই ধারাবাহিকতায় ষষ্ঠ দিন ছিল আমাদের ফিল্ড ভিজিট। ফিল্ড ভিজিটের উদ্দেশ্য ছিল সকল অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা যেন মাঠ পর্যায়ে গিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা, সে সময়ের সাক্ষী, সে সময়ে পাকবাহিনীর অত্যাচার থেকে বেঁচে ফেরা মানুষদের সাথে সরাসরি কথা বলে নিজেরা বুঝতে পারে এবং উপলব্ধি করতে পারে আমাদের ইতিহাস।

এই ফিল্ড ভিজিটকে উদ্দেশ্য করে আমাদের সকল অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল। আমাদের এই ফিল্ড ভিজিটের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য এবং আগ্রহের প্রধান কেন্দ্র ছিল, ফাদার হোমরিক এবং যুদ্ধকালীন সময়ে তার অবদান। বলা যায়, আমাদের এইবারের পুরো ফিল্ড ভিজিটটি ফাদার হোমরিককে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। ফাদার ইউজিন হোমরিক, আমেরিকান হলি ক্রস ধর্মপ্রচারক ও ধর্মযাজক ছিলেন। যিনি ছয় দশক ধরে (১৯৫৫-২০১৬) বাংলাদেশে আদিবাসীদের জীবন, সেবা ও উন্নয়নে কাটিয়েছেন। দেশের মধ্যাঞ্চলে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর বনাঞ্চলে মানুষের সেবা করেছিলেন।

আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল, Corpus Christi Catholic Church জলছত্র, মধুপুর, টাঙ্গাইল। এইখানে গিয়ে আমাদের সাথে দেখা হয় একজন সিস্টারের সাথে। যিনি আমাদেরকে চার্চটি ঘুরিয়ে দেখান। এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় কীভাবে ফাদার হোমরিক গারো কমিউনিটি, খ্রিস্টান কমিউনিটি, এক কথায় বলা যায় সংখ্যালঘুদেরকে এবং বিশেষভাবে বললে নারীদের ও শিশুদের বাঁচাতে অবদান রেখেছিলেন তার গল্প সরাসরি শুনিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় সিস্টারের নিজের বয়সই ছিল ৫ থেকে ৬ বছর। সিস্টারের মুখ থেকে শোনা কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা এখানে তুলে ধরছি- পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা এই মধুপুর অঞ্চল থেকে কিছু যুবক মুক্তিযোদ্ধাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে যখন গান পয়েন্টে রাখা হয় মেরে ফেলার জন্য তখন ফাদার হোমরিক সরাসরি সেই গান পয়েন্টের সামনে গিয়ে বলেছিল ওদের মারতে হলে আগে আমায় মারো। এই ভাবেই তিনি বাঁচিয়েছিলেন কয়েকশো প্রাণ। আকাশ দিয়ে যখন হানাদার বাহিনীর ফাইটার প্লেন উড়ে যেত তখন শিশুরা না বুঝেই বের হয়ে খুশিতে প্লেন প্লেন বলে লাফিয়ে উঠতো। যা অনেক সময় পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। ফাদার হোমরিক এমন সব শিশু ও নারীদের পাকিস্তানি বাহিনীরা সেই অঞ্চলে হানা দিলে গহীন বনে এবং নিজের চার্চে লুকিয়ে রাখতেন, আশ্রয় দিতেন। যার ফলশ্রুতিতে অনেক শিশুর অকাতরে প্রাণ ঝরে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিল এবং অনেক নারী বেঁচে গিয়েছিল ধর্ষণ থেকে।

আমাদের দ্বিতীয় এবং শেষ গন্তব্য ছিল, সাধু পৌলের ক্যাথলিক গির্জা-পীরগাছা, মধুপুর, টাঙ্গাইল। এইখানে যাওয়ার পথে মধুপুর অঞ্চলের বিখ্যাত আনারস বাগান ও কলা বাগান আমাদের সবার মনোযোগ কেড়ে নিতে পুরোপুরি সফল হয়েছিল। সেখানে পৌঁছানোর পর আমাদের সাথে দেখা হয় ফাদারের সান্নিধ্যে থাকা আরও পাঁচ ব্যক্তির সঙ্গে। যার মধ্যে চারজন পুরুষ এবং একজন নারী ছিলেন। তারা নিরিবিলি আমাদের সাথে কথা বলার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন গির্জা থেকে একটু দূরে, সাধু পৌলের ক্যাথলিক ধর্মপল্লীর-বেথেনী আশ্রমে। প্রথমেই তাদের মধ্যে একজন আমাদের সাথে শেয়ার করে এই ধর্মপল্লীর জনসংখ্যা, কতজন মানুষ তার সান্নিধ্যে আছে এখন, এই ইউনিয়নের গির্জা, স্কুল এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা, কৃষিকাজে তাদের অগ্রসরসহ আরো নানান বর্তমান বিষয়। সেখানে কৃষিকাজে অগ্রসরতা চোখে পড়ার মতোই। এছাড়াও মেয়েদের কর্মসংস্থান তৈরিতে তাঁতপল্লীসহ আরো কিছু উদ্যোগ ছিল সত্যি বেশ প্রশংসনীয়। তারপরই তারা সকলে একে একে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ফাদার হোমরিক, তার কার্যক্রম ও অবদান আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। তারা জানিয়েছিলেন কীভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী থেকে এক লোভনীয় প্রস্তাব পেয়েও ফাদার হোমরিক বেছে নিয়েছিলেন মানবতাকে। পাক বাহিনী ফাদারকে প্রস্তাব দিয়েছিল যদি তিনি মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গোপনীয় খবর পাকবাহিনীর সাথে আদান প্রদান করেন তাহলে তারা ফাদারের যারা ফলোয়ার আছেন, ফাদারের নিজের কমিউনিটির লোক আছেন, তাদের কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু ফাদার তাতে কখনোই রাজি হননি। এই ঘটনাটাই সবচেয়ে বড় সাক্ষী বলে তারা মনে করেন যে, ফাদার নিজ কমিউনিটির বাইরেও বাঙালি- মুসলিমসহ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সত্য ও ন্যায়ের পথে ছিলেন।

ফাদারের দৃঢ় মনোবল, অপ্রতিরোধ্য সাহস এবং বিচক্ষণতার প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন তিনি গান পয়েন্ট থেকে বলেছিলেন, তাদেরকে মারতে হলে আগে আমায় মারো। আর আমি মারা গেলে কাল আমেরিকার পত্রিকায় খবর ছাপা হবে কীভাবে তোমরা একজন আমেরিকান মিশনারী

ধর্মযাজককে মেরে ফেলেছ। তা নিশ্চয়ই তোমাদের দেশের প্রতি বিদ্বেষ বহিঃবিশ্বে খানিকটা বাড়িয়েই দিবে। এই ভাবেই তিনি নিজেকে এবং আরো কিছু তাজা প্রাণ ঝরে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

ফাদার হোমরিকের ওপর মানুষের অগাধ বিশ্বাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তারা বর্ণনা করেন, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা শিশুদের ভয় দেখাতে আসলে বা মারতে আসলে তারা বলতো, আমায় কিছু করতে আসলে আমি কিন্তু ফাদারকে বলে দিব।

এমন আরো নানা তথ্যের ভান্ডার সেই সময় সাক্ষী থাকা এবং ফাদারের সান্নিধ্যে থাকা মানুষগুলোর মুখ থেকে সরাসরি শোনার পর, একটি কথা বলাই বাহুল্য যে, ফাদার হোমরিকের জন্যই এই মধুপুর অঞ্চলে হত্যা, গুম, ধর্ষণের সংখ্যা নেই বললেই চলে।

তাদের কথা শেষ হবার পর, আমাদের অংশগ্রহণকারীরা আরো জানার আগ্রহ থেকে তাদের সাথে একটি প্রশ্ন-উত্তর সেশন করেন। এর মাধ্যমেই সেদিন শেষ হয়েছিল আমাদের ফিল্ড ভিজিটের এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। সেখান থেকে ফিরে রাতে ছিল সেই ফিল্ড ভিজিটের উপর আমাদের সকল গ্রুপের এক একটি প্রেজেন্টেশন। এখানে প্রতিটা টিম ফাদারের আলাদা আলাদা অবদানগুলোকে এক একটি টপিক বানিয়ে তাদের প্রেজেন্টেশন দিয়েছিল। এইভাবেই পরিপূর্ণভাবে সমাপ্তি ঘটে আমাদের ফিল্ড ভিজিটের।

-তানজিম মালিহা

ভলান্টিয়ার, সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ উপলক্ষে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ উপলক্ষে গত ৮ মার্চ, ২০২৪ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে চলচ্চিত্র "Things I Could Never Tell My Mother" এর বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা হুমাইয়ারা বিলকিস। প্রদর্শনী শেষে নির্মাতা "চলচ্চিত্রে নির্মাতার আত্ম-প্রতিকৃতি" বিষয়ে উপস্থিত দর্শকদের সাথে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। জাদুঘরের চলচ্চিত্র কেন্দ্র আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের এবং উন্মুক্ত আলোচনা সঞ্চালনা করেন নৃতত্ত্ববিদ ও চলচ্চিত্র নির্মাতা নাসরিন সিরাজ এ্যানী। ৮০ মিনিটের এই চলচ্চিত্রে নির্মাতা হুমায়রা বিলকিস তার মা ও নিজের জীবনের কথা তুলে ধরেন। একসময় তার মা ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা নারী, যিনি তার স্বামীর নাম যুক্ত না করে নিজের নাম রাখেন। যা তখনকার বাঙালি সংস্কৃতিতে ভালো চোখে দেখা হতো না। এমনকি তিনি মুক্তচিন্তার কবিতাও লিখেতন। কিন্তু মক্কায় হজ্জ করে আসার পর তিনি একজন নিষ্ঠাবান ধার্মিক মুসলিম হয়ে ওঠেন এবং এখন প্রায়ই সময় ধর্মীয় উপদেশ দেন। ভারতে ফিল্ম একাডেমিতে পড়াশোনা শেষ করার পর, হুমাইরা বিলকিস সাময়িকভাবে বাংলাদেশে ফিরে আসেন তার বাবা-মায়ের সাথে থাকতে। স্বাধীনচেতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ, তিনি তার মায়ের থেকে একেবারেই আলাদা। চলচ্চিত্রটিতে, আগের সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করার আশায় তিনি তাদের পুরনো ছবি ও তার মায়ের কবিতা খুঁজে বের করেন। পাশাপাশি একজন অন্য ধর্মের ব্যক্তির সাথে তার সম্পর্ক একটি জটিল কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

চলচ্চিত্রটি সুইজারল্যান্ডের Visions du Réel, International Documentary Film Festival Amsterdam-সহ দেশে বিদেশের বহু চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে।

শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক স্মরণে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ প্রতিবছরের মতো এবারেও অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক স্মরণে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। ২৪ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের পারিবারিক সহায়তায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। শত শত শিশু-কিশোরদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আয়োজনটি উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। এ বছর দুটি দলে বিভক্ত হয়ে ছবি আঁকে শিশু-কিশোরেরা। শিশুদের ছবি আঁকার বিষয় ছিল উন্মুক্ত এবং কিশোরদের বিষয় 'স্বাধীনতা'। চিত্রাঙ্কন শেষ হওয়ার পরপরই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে। প্রতিযোগী এবং তাদের অভিভাবকে হলঘর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় শিশু কিশোরেরা গান, ছড়া ও কবিতায় মুগ্ধ করে রাখে দর্শকদের। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশ বরেণ্য শিল্পী রফিকুন্নবী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের, চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, আগরতলা ঐতিহাসিক মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আলীর সহধর্মিণী মাজেদা শওকত, সার্জেন্ট জহুরুল হকের পারিবারের সদস্য নাজনীন হক মিমি ও মোনামী হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী আবুল বারক আলভী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ড. সারওয়ার আলী এবং ছড়াকার আখতার হুসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সার্জেন্ট জহুরুল হকের পরিবারের পক্ষ থেকে সার্জেন্ট জহুরুল হক ফান্ডের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে ১ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদানের আগে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় শিল্পী রফিকুন্নবী বলেন, বড়োদের ছোটদের উপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। শিশুদের তাদের মতোই ছবি আঁকতে দেওয়া উচিত, গান গাইতে দেওয়া উচিত, নাচতে দেওয়া উচিত। শিশুরা অনেক কঠিন জিনিসও সহজ করে উপস্থাপন করতে পারে। শিশুদের চিন্তার জগৎ অনেক বড়ো, তাদের স্বাধীনভাবে ছবি আঁকতে দেওয়া উচিত। তাহলে অনেক সৃষ্টিশীল ভাবনার প্রতিফলন তাদের ছবিতে আমরা দেখতে পাব। বিখ্যাত টোকাই ছবির স্রষ্টা আরও বলেন পথশিশুদেরও এরকম আয়োজনে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। ছড়াকার আখতার হুসেন ছোটদের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট জানতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে আগরতলা ঐতিহাসিক মামলা এবং ঊনসত্তরের ভূমিকা ও সার্জেন্ট জহুরুল হকের কথা তুলে ধরেন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, সার্জেন্ট জহুরুল হকের পরিবারকে সাধুবাদ জানান শিশু-কিশোরদের নিয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য ও অভিভাবকদের কৃতজ্ঞতা জানান তাদের ছেলেমেয়েদের এমন অনুষ্ঠানে নিয়ে আসার জন্য। ফরিদুর রেজা সাগর বলেন, বড়ো মানুষ হতে হবে, বড়ো মনের মানুষ হতে পারলেই সকলে মনে রাখবে।

মুক্তিযোদ্ধা ও শিল্পী আবুল বারক আলভী জানান, ছোটদের আঁকা ছবির প্রতি তাঁর ভালো লাগার কথা। সবার ছবির মধ্যেই আলাদা সৌন্দর্য্য রয়েছে। তাই ছবি দেখে বিচার করা তাঁর জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী শিশুদের উদ্দেশে বলেন, 'যারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে আত্মত্যাগ করেছেন তাদের সকলের অবদানকে স্বীকৃতি জানাতে পারলেই এই চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সফল হবে।' মাজেদা শওকত ভাষার মাসে সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি শিশুদের দেশকে ভালোবাসার কথা বলেন, মানুষকে ভালোবাসার কথা বলেন। তিনি বলেন আগরতলা ঐতিহাসিক মামলার সময়ই বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। সেই সময়ে অর্থাৎ ঊনসত্তরে সার্জেন্ট জহুরুল হককে জেলবন্দী করা হয় এবং পরবর্তীতে জেলখানায় তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সেদিন আরও দুজনকে হত্যা করা হয় সার্জেন্ট ফজলুল হক এবং হাবিলদার মুজিবুর রহমানকে। আন্দোলনের ফলে আগরতলা ঐতিহাসিক মামলা প্রত্যাহারের পর শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে ছাড়া পেলে ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শিশুদেরকে বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে জানাতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। আলোচনার পর প্রতি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থসহ পাঁচটি করে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী শিশুকেই সনদ দেওয়া হয়। আনন্দঘন পরিবেশে সার্জেন্ট জহুরুল হক স্মরণে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটে।

তাহুয়া লাভিব তুরা
স্বেচ্ছাকর্মী, শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

ভাষার মাসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি, পাকিস্তানি শাসনামল শুরু হবার পর বাঙালির সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ যেন ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়। ধীরে ধীরে বাঙালি সচেতন হতে শুরু করে নিজের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে। ৫২র সংগ্রামের বীজ থেকে একসময় বাংলার মানুষের জীবনে আসে মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গল্প বলা দাদুর মতো বলে চলে জয় বাংলার যাত্রার কথা। দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীর স্মৃতির ভান্ডারে জমা হয় বাংলার মানুষের বীরত্ব গাথা। ভাষার মাস জুড়ে অসংখ্য মানুষের পদচারণায় মুখরিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রদর্শনশালা। খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, তরুণ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি দল, স্কুল-কলেজ এবং মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের আগমন ছিল চোখে পড়ার মতো।

২১শে ফেব্রুয়ারির দিনে সস্ত্রীক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে এসেছিলেন কাদেরিয়া বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নূরুন নবী। নিজেদের ছবি দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত পোশাক দেখে স্মৃতিচারণ করেন ৭০ সালের একটি ঘটনার, একবার সৌভাগ্য হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর কোট গায়ে জড়ানোর। ঐদিনই আরেকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা সপরিবারে এসেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে। মুক্তিযোদ্ধা বাবার প্রবাসী কন্যাটি ২৫শে মার্চের গণহত্যার দিনগুলো, শরণার্থী শিবিরের ছবি দেখে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকেন, দু-চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা।

কল্যাণপুরের একটি মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা ইলিয়াস উর রহমান বেশ কয়েকজন (হাফেজ) ছাত্রকে নিয়ে এসেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে। ছাত্রদের খুব সুন্দর করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলছিলেন। কথা বলে জানতে পারি নিজ উদ্যোগেই ছাত্রদের দেশের ইতিহাস সম্পর্কে জানাতে নিয়ে এসেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'এক্সপোজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস' একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রকল্প উন্নয়ন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতারা দলবেঁধে এসেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস আয়োজিত নবম উইন্টার স্কুলের শিক্ষার্থীরা এসেছিলেন বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের ইতিহাসের পথচলা দেখতে। ২৫শে মার্চের গণহত্যার স্বীকৃতি আজও মেলেনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে, এত তথ্য প্রমাণ থাকার পরও পাকিস্তানিরা অস্বীকার করে যায় গণহত্যার কথা।

১৯৭১ সালে নিক্সন-কিসিঞ্জারের পাকিস্তানপন্থী নীতি দেখে আমেরিকান দূতাবাস থেকে আগত অতিথিদের ভ্রু কুঁচকে গেলেও শ্রদ্ধা জানায় মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দেওয়া শহিদদের। প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর জে ডি র‍্যাঞ্জেল জানান বাংলাদেশে তার দেখা সবচেয়ে সুন্দর এবং গোছানো জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

এছাড়াও ফাগুনের পাতা ঝরা দিনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসেছিলেন বাংলা গানের পাখি মৌসুমী ভৌমিক এবং বিখ্যাত ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন। লুৎফর রহমান রিটন কথা দিয়েছেন আবার যেদিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে আসবেন, মন্তব্যের খাতায় একটি ছড়া লিখে যাবেন।

জহির রায়হান তাঁর আরেক ফাল্গুন উপন্যাসে লিখেছিলেন আসছে ফাগুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো। স্বাধীনতার এত বছর পর ফাগুনের দিনগুলোতে দর্শনার্থীদের পদচারণা দেখে মনে হয়েছে জহির রায়হানের ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হয়েছে।

ইয়াছমিন লিসা
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

জেনোসাইড স্টাডিজ: রেসপন্স এন্ড রেসপন্সিবিলিটি

১ম পৃষ্ঠার পর

মফিদুল হক; ড. নাভরাজ আফ্রিদি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অব হিস্টোরি, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, কলকাতা, ভারত; ইমরান আজাদ, অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ এবং কো-অর্ডিনেটর, সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস; শাওলী দাশগুপ্তা, লিগাল কাউন্সেল, ব্রাক এবং ভলান্টিয়ার, সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস। সবশেষে একটি দলীয় কাজ ও উপস্থাপনা ছিলো। তৃতীয়দিন পাঁচটি সেশন নেন যথাক্রমে ড. থেরেসা ডি ল্যাংগিস, প্রফেসর অব গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিস, আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ নমপেন্, কম্বোডিয়া; সুমাইয়া ইকবাল, লেকচারার, ডিপার্টমেন্ট অব ক্রিমিনোলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মৌসুমী ভৌমিক, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও গবেষক; ড. কাবেরী গায়েন, প্রফেসর অব মিডিয়া অ্যান্ড জার্নালিজম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. সুসান ভাইজ, ইউনেস্কো অফিসার-ইন-চার্জ, বাংলাদেশ। চতুর্থদিন তিনটি সেশন নেন ড. রেজিনা বেগম, রিসার্চ অ্যান্ড লাইব্রেরি ইনচার্জ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর; মো. তারিক মুর্শিদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইন ল, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. ইমতিয়াজ এ হুসাইন, প্রফেসর, গ্লোবাল স্টাডিজ অ্যান্ড গভর্ন্যান্স, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, পরিশেষে একটি প্যানেল আলোচনা হয় ড. ইমতিয়াজ এ হুসাইন, প্রফেসর, গ্লোবাল স্টাডিজ অ্যান্ড গভর্ন্যান্স, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ; ড. নাভরাজ আফ্রিদি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অব হিস্টোরি, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, কলকাতা, ভারত; জনাব মফিদুল হক, পরিচালক, সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনসাইড অ্যান্ড জাস্টিস এবং ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সমন্বয়ে এবং রাতে বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মৌসুমী ভৌমিকের সাথে সুরের মূর্ছনায় মেতে ওঠে সবাই। পঞ্চমদিন পাঁচটি সেশনে পাঠদান করেন কাজী ওমর ফয়সাল, লেকচারার ইন ল, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ; মো. ইকরা, লেকচারার, ডিপার্টমেন্ট অব ল, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ এবং ফরমার রিসার্চ ফেলো অব সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস; হুমায়রা বিনতে ফারুক, প্রোগ্রাম সাপোর্ট অফিসার, ইউএন ওমেন বাংলাদেশ; অ্যাডভোকেট কাউসার আহমেদ, সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ; ফরহাদ আহমেদ, লেকচারার ইন ল, ফেনী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সার্ক পিএইচডি ফেলো, সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও একটি প্যানেল আলোচনা হয় যেটিতে অংশ নেন সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের জিয়া উদ্দিন তারেক আলী রিসার্চ ফেলো মেহজাবিন নাজরানা, তাবাসসুম ইসলাম তামান্না ও তাবাসসুম নিগার ঐশী। ষষ্ঠদিনটি ছিল অংশগ্রহণকারীদের জন্য এক ভিন্ন অভিজ্ঞতার দিন। বাঁধাধরা রুটিন জীবনের পাঁচদিন পর সবার সুযোগ হয় একটু মুক্ত বাতাস পাবার। এদিন আয়োজিত হয় ফিল্ড ট্রিপ। সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয় মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখা ফাদার ইউজিন হোমরিকের স্মৃতিবিজড়িত জলছত্র, মধুপুর, টাঙ্গাইল। সবাই প্রথমে জলছত্রের কর্পাস ক্রিস্টি চার্চ পরিদর্শন করে এবং এরপর সাধু পলের ক্যাথ লিক গীর্জা, পীরগাছা, মধুপুর-টাঙ্গাইলে যায়। সাধু পলের ক্যাথলিক গীর্জার বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক ফাদার লরেঞ্জ অংশগ্রহণকারীদের কয়েকজন গারো জনগোষ্ঠীর সদস্যর সাথে মতবিনিময়ের সুযোগ করে দেন। এতে মুক্তিযুদ্ধের সময় ফাদার ইউজিন হোমরিকের অবদান, মুক্তিযুদ্ধে গারো জনগোষ্ঠীর লোকদের অংশগ্রহণ এবং সমর্থন এসব বিষয়ে জানার এবং জানানোর খুব ভালো একটি সুযোগ তৈরি হয়। ট্রিপ থেকে ফিরে অংশগ্রহণকারীদের আহরিত তথ্যের ভিত্তিতে তাদের দলীয় পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়।

সপ্তম দিনটি শুরু হয় সর্বশেষ লিখিত পরিক্ষা দিয়ে। এরপর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি এবং সদস্য-সচিব সারা যাকের মুক্তিযুদ্ধের সময় তার হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের স্মৃতি সবার সাথে ভাগ করে নেন। পরবর্তী সেশন নেন শাহরিয়ার কবির, নির্বাহী সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। উইন্টার স্কুল থেকে যে জানা ও শেখা তা অংশগ্রহণকারীরা কীভাবে কাজে লাগাতে চায় এবং পারে তা নিয়ে একটি সেশন হয়। ভারতেশ্বরী হোমসের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন হয়। সবশেষে অংশগ্রহণকারীরা নিজেরা গান, কবিতা এবং নাচ পরিবেশনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ইতি টানে।

অষ্টমদিন জাদুঘরে পৌঁছানোর পর নন-জুডিশিয়াল হেয়ারিং আয়োজিত হয়। এরপর অংশগ্রহণকারী, ভলান্টিয়ার এবং মেন্টররা তাদের অভিজ্ঞতা সবার সাথে ভাগাভাগি করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী মৌসুমি ভৌমিক। বক্তব্য প্রদান করেন মফিদুল হক, পরিচালক, সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনসাইড অ্যান্ড জাস্টিস এবং ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং ডা. সারওয়ার আলী, ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। তারপর পুরস্কার বিতরণী ও অংশগ্রহণকারী ভলান্টিয়ার এবং মেন্টরদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণের মাধ্যমে শেষ হয় অষ্টমদিনের কার্যক্রম।

এভাবেই তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে এগিয়ে নেওয়ার বীজ বপনের মাধ্যমে পর্দা নামে নবম বার্ষিক উইন্টার স্কুলের।

এস এম নাহিদ সারোয়ার সুমন
ভলান্টিয়ার, সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস

যুদ্ধপুরাণ মঞ্চায়ন; চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

১ম পৃষ্ঠার পর

কথায় প্রমিলা হতাশ হবে না উৎসাহিত হবে সেটা তার অভিব্যক্তিতে পরিস্কার না। ওদিকে রফিক ভাইয়ের তাড়া। সবকিছু মিলিয়ে উপস্থিত সবাই প্ল্যান করি স্যোসাল মিডিয়ায় প্রচারণা বাড়ানোর। মহড়াও চলে- প্রচারণাও চলে, তাতে কিছুটা আশার আলো দেখতে পাই আমরা। কোন সপ্তাহে পাঁচ দিন, কোন সপ্তাহে চার দিন, কোন সপ্তাহে তিন দিন মহড়া চলে আর চলে স্যোসাল মিডিয়া ও ব্যক্তিগত প্রচারণা। সেই সাথে চা-পুরি-সিঙ্গাড়া তো আছেই। ক্রমশঃ সদস্য সংখ্যা বাড়ছে বটে তবে যে গতিতে বাড়ছে তাতে চল্লিশের ঘরে কবে পৌঁছাতে পারবো সে দুশ্চিন্তা বাড়ছে সুপারসনিক গতিতে।

সবুজ ঘাসে মহড়া

ক্রমশঃ আমাদের সদস্য বাড়ছে। মহড়া কক্ষে (জল্লাদখানা বধ্যভূমির কক্ষ) স্থান সংকুলান হচ্ছে না। তাতে আমরা যতটা আশান্বিত হচ্ছি সংখ্যার বিবেচনায় হতাশাও ঘিরে ধরছে। নির্দেশকের কপালের ভাঁজ রিডিং গ্লাস ছাড়াই পড়া যাচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রমিলাও বুঝতে পারছে যে, এই প্রযোজনায় কেন চল্লিশজন নাট্যকর্মী প্রয়োজন। তাই তার অভিব্যক্তি এখন পরিস্কার।

এই পর্যন্ত সদস্য সংখ্যা যা হয়েছে তা নিয়েই পরিবেশ থিয়েটার যুদ্ধপুরাণ এর জন্য সত্যিকারের যুদ্ধটা শুরু করাই যায়। তাই মহড়া কক্ষ ছেড়ে যুদ্ধপুরাণ টিম চলে আসে সবুজ ঘাসের পাশে বাদাম গাছের তলায়। দিনের দৈর্ঘ্য আস্তে আস্তে বাড়ছে, কমছে শীত। পাতা শূণ্য হচ্ছে কাঠবাদাম গাছ, বার্তা দিচ্ছে বসন্তের আগমনের। এই বসন্তের শেষেই আবার সবুজ পাতায় ভরে উঠবে গাছটি। সবুজ ঘাস ঘিরে থাকা কংক্রিটের দেয়াল আর কাঠবাদাম গাছের পাশের দেয়ালই এখন আমাদের মহড়ার স্থান। এখন পর্যন্ত যে কজন সদস্য পাওয়া গেছে তাদের সাথে নির্দেশক তার নাট্যভাবনার ভাব আদান-প্রদান করছেন। সংখ্যাটা এখন নেহাতই মন্দ নয়। এবার আমরা কংক্রিটের দেয়াল ছেড়ে সবুজ ঘাসের উপরে শরীর চর্চা করছি। থিয়েটার গেম, কম্পোজিশন প্ল্যান, প্ল্যান অনুসারে কম্পোজিশন, বেশ অগ্রগতি হচ্ছে। এখন আমাদের সদস্য সংখ্যা চল্লিশ ছুঁইছুঁই।

পেশার প্রস্তুতি

বসন্ত শুরু হয়েছে। ১লা ফালগুনে (১৪ ফেব্রুয়ারি) কেউ কেউ ফাগুনের রং বাসন্তিতে মজেছে। তার ছোঁয়া মহড়ায়ও এসে লেগেছে। মহড়া বলা চলে জমজমাট না হলেও জমাট বাধতে শুরু করেছে। ২৯ ফেব্রুযারি, ১ ও ২ মার্চ এই তিন দিন ডে-লং মহড়ার পরিকল্পনা করা হয়। ৩ মার্চ টেকনিক্যাল শো এবং ৪ মার্চ থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন দুটো করে শো-এর প্ল্যান করা হয়। এভাবে চলতে চলতে ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে যুক্ত হতে থাকে সিনিয়র নাট্যকর্মীরা যারা ২০১৪ সালের যুদ্ধপুরাণের স্টোরি ট্রেলার ও অন্যান্য পারফর্ম করেছিলেন। কনা, কান্তা, এহসান, বাবু, পলিন, বাদল, জুয়েল, নির্ঝর এরা যুক্ত হওয়াতে এবং আমাদের অমি, অদিতিয়া, ভূমিকা ওদের মায়েরাও যখন এই নাটকে যুক্ত হয় তখন আমাদের মনোবল এত মজবুত হয়ে যায়, যেন হিমালয়ের চূড়ায় বসে দেখতে পাই জল্লাদখানায় যুদ্ধপুরাণ শো চলছে। এমন এক সময় বরুণ বলে- আমার একটা ৬-৭ বছরের শিশু লাগবে, যাকে দাঙ্গার সময় মঞ্চের এপাশ থেকে ও পাশে ছুঁড়ে মারা হবে। এভারেস্ট চূড়া থেকে ভূমিতে পতন ঘটে আমার। এখন এই শিশু কোথায় পাই?

বরুণ মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে। প্রমিলা, আমি, রফিক ভাই সমন্বয় করে যাচ্ছি। পরিবেশ থিয়েটার তাই সেট নেই আছে সেট প্রপ্স। সেই সেট প্রপ্স, লাইট, পোশাক এগুলো সংগ্রহ, কেনা বা নির্মাণের প্রস্তুতি চলছে। লাগবে দক্ষ ডেকোরেটর কোম্পানি, পুরো জল্লাদখানা কালো কাপড়ে ঢেকে দিতে হবে। একই ধরণের ৭০টি পোশাক লাগবে, যুদ্ধপুরাণ আগে যেহেতু বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি করেছিল তাই তাদের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব রফিক ভাই নিলেন। যদি ওদের থেকে পোষাকগুলো পাওয়া যায় তবে পোষাকের জন্য খরচ ও সময় দু'টোই বাঁচবে। কিন্ত লাভ হলো না, শিল্পকলা একাডেমি থেকে কিছুই পাওয়া গেল না। পোশাক তৈরি করতে অন্তত একটা আগের তৈরি পোশাক পেলেও হয়, স্যাম্পল হিসেবে। আর বেশী দিন নেই, এখন অর্ডার করতে না পারলে শোর আগে পোশাক হাতে পাওয়া নিয়ে শংকা তৈরি হচ্ছে। যুদ্ধপুরাণ-এর জন্য নির্দেশকের চাহিদামত ৬-৭ বছরের শিশু পাওয়া গেছে, নাম আয়ানা। আমাদের নাটকে এখন একক পরিবারের ওরাই বড় টিম। আয়ানা, অদিতীয়া, অরিত্রা এবং ওদের মা নাসরিন। এক পরিবারের চারজন। এমন তিনজনের টিম আছে, দুজনের টিম আছে আমাদের এই যুদ্ধপুরাণে।

পোশাক তৈরি স্যাম্পল অবশেষে হাতে পেলাম। খোঁজ চালান হলো ১০ নাম্বার ঝুটপট্টিতে পরিচিত দোকানে কম দামে কাপড়ের জন্য। আমি, রফিক ভাই সাথে শহিদ পরিবারের ফরিদ ভাই ও হামিদ ভাই। এখানে এই কাপড় এত পরিমাণ নেই, সদরঘাট থেকে এনে দিতে পারবে বলে জানালেন দোকানদার।

রানথ্রো ও টেকনিক্যাল শো

সব প্রস্তুতি শেষ, সদস্য সংখ্যা এখন চল্লিশ। ১ মার্চ রানথ্রো এবং ২ মার্চ লাইট ও সাউন্ডসহ টেকনিক্যাল শো এবং ৩ মার্চ ডামি দর্শকসহ টেকনিক্যাল শো এবং প্রেস শো। ৪ মার্চ থেকে ৭ মার্চ প্রতিদিন ৩টি করে শো চূড়ান্ত করা হয়। এখন মনে হচ্ছে যুদ্ধজয় সম্ভব।

কাঠবাদাম গাছ সবুজ পাতায় ভরে গেছে। ডে-লং মহড়ায় ও আমাদের প্রায় দুপুর পর্যন্ত ছায়া দিবে এখন। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে আমরা। পোশাক অর্ডার দিতে দেরি হওয়ায় ১ মার্চ কোন পোশাক হাতে পাইনি। ৩ তারিখ রাতে প্রেস শোর আগে সব পোশাক বুঝে পেলাম।

মাহেন্দ্রক্ষণ

সকল প্রতিবন্ধকতাকে সমন্বয় করে ৪ মার্চ আমাদের দর্শক শো শুরু হলো- শেষ হলো ৭ মার্চ। প্রতিদিন ৩টি করে শো করার প্ল্যান, কিন্তু ৭ মার্চ তিনটি শো-এর পরে দর্শকদের অনুরোধ ৪র্থ শো করার প্রস্তাব এলে আমরা শো করি। ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ মার্চ পাঁচদিন টানা শো করে সকলেই ক্লান্ত হলেও দর্শক অনুরোধে সবাই চাঙ্গা। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি এই যে প্রেম- শহিদদের কথা মানুষকে জানাতে এই যে চাঙ্গা ভাব এটাই আমাদের সফলতা।

যুদ্ধপুরাণ এর অন স্টেজ ৪০ জন এবং টিমে আরও ২০ জন সবাই আমরা ১৫তম শো করার পর বুঝতে পারলাম কে কতটা দুর্বল বা অসুস্থ্য। গায়ে জ্বর- গলায় খুক খুক কাশি নিয়ে ছোট্ট আয়ানা যে ম্যাজিক আমাদের দেখালো সেটাই আমাদের প্রাপ্তি। নাটক শেষে দর্শক অনুভূতি আমাদের প্রেরণা।

সম্ভাবনার নতুন দ্বার

আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে মিরপুরের বাইরের যারা যুদ্ধপুরাণের সদস্য হয়েছেন তারা প্রায় সকলেই মুক্তিযোদ্ধার বা মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান বা শহিদ পরিবারের সন্তান। প্রাণের টানেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আয়োজনে সম্পৃক্ত হয়েছেন। যারা উল্লেখিত পরিবারের নয় তারাও এই চেতনায় উজ্জীবিত। সর্বোপরি একই আদর্শের এক মিলনমেলা বসেছিল জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠে। জানুয়ারি ১৫ থেকে ৭ই মার্চ পর্যন্ত ৫২ দিনের কর্মপ্রচেষ্টা আমাদের যুদ্ধপুরাণ। এ এক নতুন সম্ভাবনা।

সগীর মোস্তাফা
সমন্বয়ক, যুদ্ধপুরাণ

এক্সপোজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস ২০২৪

২-এর পৃষ্ঠার পর

ইসলাম শুরুতেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্বোধনী সম্পর্কে কথা বলেন। কীভাবে ১৯৯৬ সালের ২২শে মার্চ সেগুনবাগিচার একটি ভাড়া বাড়িতে ছোট্ট করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সূচনা হয়। কীভাবে আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্থায়ী ঠিকানা হয়। তিনি জাদুঘরের মোট আটজন প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টির মধ্য থেকে প্রয়াত তিনজন ট্রাস্টি আলী যাকের, কবি স্থপতি রবিউল হুসাইন, জিয়াউদ্দিন তারেক আলীকে স্মরণ করেন। রফিকুল ইসলাম জাদুঘরের নিয়মিত কর্মসূচি, ভবন নির্মাণের ইতিহাসসহ অন্যান্য বিষয় কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে তুলে ধরেন। এই কর্মালার মধ্য দিয়ে সবাইকে জাদুঘরের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান ও ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর কর্মশালা পরিচালক ফরিদ আহমেদ আগামী ৩দিনের কর্মশালার বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, 'এই ৩দিন আমরা নিজেদের মধ্য পরিচিত হবো এবং নিজদের প্রামাণ্যচিত্র ভাবনা সবার সাথে শেয়ার করবো। কর্মশালার ২য় পর্ব আগামী এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে পর্যন্ত আমরা সবাই নানাভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত থাকার চেষ্টা করবো।

এখানে অনেকেই নতুন নির্মাতা আছেন, আবার অনেকেই অভিজ্ঞ নির্মাতা আছেন, যারা সবাই মিলে ৩টি দলে ভাগ হয়ে যাবো। প্রথম দলটি হবে ব্যক্তি বা চরিত্র নির্ভর কাহিনিগুলোর উপর, দ্বিতীয়টি বিষয় নির্ভর ও তৃতীয়টি ঘটনা নির্ভর। এই দলগুলোর কেউ যখন তার ভাবনা শেয়ার করবেন তখন বাকিরা চেষ্টা করবেন অংশ নেয়ার।

এরপর তিনি কর্মশালার আউটলাইন নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের কিছু ধারণা দেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি এক্সপোজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস এবং জাদুঘর আয়োজিত বাংলাদেশের অন্যতম প্রামাণ্যচিত্র উৎসব "লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ"-এর ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রামাণ্যচিত্র উৎসবটি আয়োজন করার উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে দেশ ও দেশের বাইরে যে সব প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ হয়েছে সেগুলোর সাথে নতুন প্রজন্মের পরিচয় করিয়ে দেয়া। তার পাশাপাশি যারা তরুণ নির্মাতা, তাদের কীভাবে আরো প্রণোদনা প্রদান করা যায়।

তিনি অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে বলেন, আমি বলতে চাই আপনারা প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়্যালি একটা থিমের উপর কাজ করবেন। কিন্তু নিজেদেরকে একটি দল হিসেবে বিবেচনা করুন। মনে করুন আপনারা সম্মিলিতভাবে একটা কাজ করছেন, আর সেই সম্মিলিতভাবে কাজটা কি ? সেই কাজটা হচ্ছে স্মৃতিচারণ, ইতিহাস যাত্রা। তার সঙ্গে এই যাত্রাটা হচ্ছে মূল্যবোধকে তুলে ধরা, তুলে ধরা বাংলাদেশের মানুষের বিশাল সংগ্রামটা। আমরা চাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত কাজ হোক। তার সঙ্গে এখানে অন্য যেসব বিষয় আছে সেগুলোও হোক কিন্তু গুরুত্ব দিচ্ছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উপরে।

এম. ফারহাতুল হক
সমন্বয়ক, চলচ্চিত্র কেন্দ্র, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

The 9th Annual Winter School
Unforgettable Journey to Study Genocide

The Winter School organised by the Center for the Study of Genocide and Justice, Liberation War Museum, is an annual a-week program that is very popular among students and young professionals to study genocide. This year, we are lucky to have experienced this program with more than thirty students and young professionals from Bangladesh, India, and Indonesia.

The school offered us many exciting topics, the opportunity to learn from prominent speakers and experts in the field, as well as experience the interactive teaching methods that make this program different from other similar schools. As an Indonesian participant, studying genocide is essential since, at least, we know the genocide was carried out against people accused of being communists in Indonesia in 1965/1966. It is estimated that the death toll reached more than a million people. Furthermore, the 'slow genocide' has also been committed in West Papua until now, targeting the indigenous community in the eastern part of Indonesia. Those cases were also mentioned during the session of 'Genocide and Mass Atrocity in Asia' by Dr. Theresa de Langis, one of the speakers in the 9th Winter School. During the discussion, we see the similarity of the practice of genocide in Asia and its impact on the people, which creates a unique connection, particularly between Indonesia and Bangladesh.

Learning about genocide in Bangladesh was a great opportunity, considering that Bangladesh had a long experience of genocide during the Liberation War back in 1971. None of us have ever visited Bangladesh before and know nothing about Bangladesh and the history behind it. However, as young professionals who are working as a lawyer as well as humanitarian workers who focus on human rights and refugees in Indonesia, we are fully aware of the close relationship between genocide and refugees. The various sessions we learned during the program excite us to finally refresh our knowledge by learning in the classroom again after some time working professionally. During seven days of school, surprisingly, we not only learned about the practice of genocide in many countries in the world but also interacted with the survivors and eye-witnesses of the genocide during the Liberation War in Bangladesh, visited the memorial site in Jolchhatra and built solidarity among all participants.

By learning about genocide from other countries and seeing it from different perspectives, we can learn deeply that genocide is extensive. One example of genocide cannot describe the whole case of genocide in the world. We are aware that even after the international community adopted the Genocide Convention in 1948, cases would still be happening. The state must not only protect but also play an active role in recognizing the origin of genocide in society by engaging with civil society to raise awareness of the Genocide Convention, as well as to remember and pay respect to the victims of this crime. Continuing to speak out and not forgetting what happened will be a strong reason not to allow similar crimes to happen again and for history to repeat itself in the future.

Personally, we found the session regarding Rohingya refugees in Bangladesh the most interesting out of all. The fact that more than 2 million Rohingya refugees are located in Cox's Bazar, Bangladesh, which makes it the biggest refugee camp in the world, opened our understanding of the ground situation of refugee issues, which we previously only learned from the news and books. It became more special because we learned it while we were in Bangladesh, so to hear the perspective of people in Bangladesh about the Rohingya refugees is crucial.

As stated in the title of the 9th Winter School "Genocide Studies: Response and Responsibility," the students and young generation have an essential role in ensuring that their generation, who did not witness or experience the genocide or any human rights violations in the past, know the history and facts on the practice of genocide that occurred in many countries. They may not directly change the law and policy nor make significant decisions in changing the international system. Therefore, the students and young generations have a responsibility to be involved in public awareness of genocide prevention and ensure their generation will avoid committing similar crimes.

The 9th winter school has officially ended, but the memories remain. We will always remember all the interesting sessions in this program, the interactive sessions during the class, as well as the new friendships that we built in a short period of time. As a person from afar, being able to closely interact with people, especially students and volunteers from different countries, experience studying in a beautiful and peaceful place like Kumudini Complex Tangail, and meet amazing speakers and mentors were more than exceptional. All of the memories stay forever, and Bangladesh will forever have a special place in our hearts.

Written by: **Jayanti Aarnee Baskoro**
& Putri Kanesia
Indonesia

The Liberation War Museum, Dhaka and My Association with it.

I cannot exactly remember since when, but I can say this with a certain degree of confidence that for a long time I had been aware of the fact that a genocide took place in my country India's immediate neighborhood just seven years before I was born. This closeness of time and space of the 1971 genocide of Bangladesh hit me even more strongly when I relocated from Greater Noida, a satellite town of Delhi, to Kolkata in 2016, just 242 kilometres from the Bangladesh border. I launched a course in Genocide Studies in the MA (History) curriculum of Presidency University, Kolkata, with the twentieth century to the present as its time frame. The course, naturally, included a discussion of the 1971 genocide of Bangladesh. I found among my students many who had their ancestral roots in Bangladesh, uprooted from there either in 1947 or 1950 or 1971. However, I had to wait for seven years before I could visit Bangladesh for the first time in January 2023. I owe that first visit and the two visits following that to the Liberation War Museum, Dhaka, an institution I have come to admire immensely. It is an institution like no other in South Asia, a region that lacks the courage to face history, which suffers from mass amnesia, often selective in nature, paving the way for distortion, manipulation, and fabrication of history. In this respect, the Liberation War Museum is like an oasis of memorialization and remembrance in a desert of amnesia. Not that there are no other museums and institutions in Bangladesh dedicated to the memory of the liberation war, but certainly none like the Liberation War Museum, which has consistently been doing what no other institution or organization has done for remembrance and memorialization in the three countries that emerged out of former British India – Bangladesh, India and Pakistan.

I was invited by the Liberation War Museum to present my paper "Competitive Victimhood and Holocaust Trivialization in Hindu Nationalist Discourse" at its 7th International Conference on Bangladesh Genocide and Justice, whose theme was "Reminiscence, Recognition and Transitional Justice". It took place in December, 2021. I managed to present at it only virtually and not in person because of the COVID-19 pandemic related international travel restrictions then. However, I managed to visit Bangladesh for the first time in my life just two years later, in 2023, when I was invited as a residential mentor at the Center for the Study of Genocide and Justice, Liberation War Museum's 8th winter school, whose theme was "Hatred, Violence and Prevention of Mass Atrocity Crimes". I gave a lecture titled "Why complacence is never an option: The Criminality of Indifference and Neutrality during Mass Atrocities". It aimed to underscore that it may not always be possible for us to confront the perpetrator, but that does not free us of our responsibility to act, for inaction is a choice in itself. We do not become bystanders by default, but by choice. While it may be utopian to think of a world without violence, it would only be realistic to realise that our lack of efforts to prevent mass violence makes the situation even worse. The key is to understand how we are responsible in spite of not being guilty of perpetration.

I returned from the winter school inspired enough to bring out a special thematic issue of the online magazine Café Dissensus in commemoration of the Bangladesh Genocide Remembrance Day, observed on 25 March. The issue was composed entirely of essays written by my students on the 1971 genocide of Bangladesh. Some of my students also released a commemorative video on YouTube, titled "MA (History) Students of Genocide Studies of Presidency Uni, Kolkata remember Bangladesh Genocide'71", available on my YouTube channel, "Dr. Navras J. Aafreedi".

It was the Liberation War Museum's 8th International Conference, which took place in November, 2023 that took me to Bangladesh again. This time I was not alone, but accompanied by six of my students, each of whom presented at the conference whose theme was "The Politics of Genocide Denial: Global Struggle towards Truth, Recognition and Justice". The presentations given by my students ranged from "Investigating the Atrocity Crimes against Intellectuals and Modes of Unarmed Resistance: Comparing Bangladesh 1971 and with World War-II Poland" to "In Liberation's Shadow: Rape, Denial and Silence in the Plight of Victims of Sexual Violence during the Bangladesh Liberation War" to "'Buried in Oblivion': Situating the Intellectual Killings of December 14 and Post-Liberation Genocide Denial within the Bangladesh Genocide" to "Other Victims of the Holocaust: Afro-Germans, Differently-abled, Romanies, Homosexuals, and Jehovah's Witnesses". I spoke on "The Denial of the Bangladesh Genocide of 1971 and the Efforts for its Recognition".

I returned to Bangladesh in February 2024 as a resource person at the Liberation War Museum's 9th winter school. Unlike the previous winter school, this time I was not alone, but accompanied by four of my students, who participated in the winter school with a deep sense of gratitude for the fee waiver that had been awarded to them by the Center for the Study of Genocide and Justice, Liberation War Museum, Dhaka. All four of them had their ancestral roots in Bangladesh and it was heart-warming to see how they and their Bangladeshi fellow participants bonded.

There are currently three students who are writing their BA Honours (History) dissertations on the 1971 genocide of Bangladesh under my supervision. Their topics are the following:

'Mukher Bhasha 'as counter-hegemony: Contextualising the intellectual discourse of the 'Bhasha Andolan' within the National Liberation Movement of Bangladesh

Breaking Barriers: Women's Diverse Engagements in Bangladesh Liberation War

Silent Echoes: A Comparative Analysis of the Victims and Children Born of Genocidal Rape in Rwanda (1994) and Bangladesh (1971)

I hope my institution, Presidency University, Kolkata and the Liberation War Museum, Dhaka can explore avenues of collaboration and work together to raise awareness of the 1971 genocide of Bangladesh to get it internationally recognised and strive for the trial and conviction of those guilty of that genocide.

Navras J. Aafreedi
Assistant Professor, Department of History
Presidency University, Kolkata.

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official